প্রথম অধ্যায়

সতীনাথ ভাদুড়ীর জীবন ও সাহিত্যকৃতি

প্রথম অধ্যায়

।। সতীনাথ ভাদুড়ীর জীবন ও সাহিত্যকৃতি ।।

কোন শিল্পী-সাহিত্যিকের সৃষ্ট শিল্প-সাহিত্যকে পর্যালোচনা করতে গেলে তার অনিবার্য অঙ্গ হিসাবে এসে যায় সেই শিল্পী - সাহিত্যিকের জীবন। সৃষ্টিকে পূর্ণাঙ্গ রূপে জানতে গেলে অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে স্রষ্টাকে জানা। স্রষ্টা তথা ব্যক্তি মানুষটিকে না জানলে তাঁর সৃষ্টিকে জানা কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না। কারণ প্রত্যেক শিল্পী-সাহিত্যিকের সৃষ্টির পিছনে লুকিয়ে থাকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নানা অভিজ্ঞতা-অনুভব-উপলব্ধি। তাই ব্যক্তি মানুষটিকে উপেক্ষা করে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আর বিশেষ করে যাঁর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবন এক অবিচ্ছিন্ন সত্তা, সেই প্রবাদ-প্রতীম সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য সৃষ্টির পর্যালোচনার পূর্বে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন জেনে নেওয়া আবশ্যক।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের তীব্র বাঙালী-বিদ্বেষের অন্যতম ফসল বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রয়াস অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাংলাদেশ সহ সারা ভারতবর্ষে যখন উত্তাল কলরোল, যখন ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে বাঙালীর জাগ্রত জাতীয়তাবোধ তীব্র আকার ধারণ ক'রে সারা দেশ জুড়ে স্বদেশী আন্দোলনে সাড়া দেয় সেই উত্তাল সময়ে ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ১১ই আশ্বিন, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বিজয়াদশমীর দিন বাংলাদেশের সেই উত্তাল পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ থেকে অনেকটা দূরে, পূর্ব বিহারের পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত বাঙালী-অধ্যুষিত পাড়া ভাট্টাবাজারের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে সতীনাথ ভাদুড়ীর জন্ম হয়। সতীনাথের পিতা ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী ছিলেন পূর্ণিয়ার একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী। যদিও সতীনাথের জন্ম বিহারের অন্তর্গত পূর্ণিয়া জেলায়, কিন্তু বংশ পরম্পরায় তাঁরা পূর্ণিয়াবাসী ছিলেন না। ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী ছিলেন মূলত কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দশকে অর্থাৎ ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে কৃষ্ণনগর থেকে পূর্ণিয়ায় চলে আসেন এবং তাঁদের এক আত্মীয় শ্রী ভুবনমোহন সান্যালের সহযোগিতায় পূর্ণিয়া জেলা আদালতে ওকালতি আরম্ভ করেন। ইন্দুভূষণ ছিলেন আইনের একজন কৃতী ছাত্র, তাই খুব অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণিয়ায় পসার জমিয়ে বসেন।

সতীনাথ ছিলেন ইন্দুভূষণ ও রাজবালা দেবীর ষষ্ঠ সন্তান। তাঁর অগ্রজরা হলেন বড়দা শিবনাথ, মেজদা ভূতনাথ, বড়দি ভবরানি, মেজদি করুণাময়ী এবং ছোট্‌দি রাধালতা। আর অনুজরা হলেন দুই বোন — শুভময়ী এবং সুনীতি। সংসারের কর্তা অর্থাৎ ইন্দুভূষণ ছিলেন পুরো পরিবারের

'কেন্দ্রীয় শাসন'। তাঁর সংসার চলত একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে। তাই ছেলেবেলা থেকেই সতীনাথরা বড়ো হয়েছেন কঠোর অনুশাসন আর শৃঙ্খলার মধ্যে। তাঁদের পরিবারে শিক্ষা ও সংস্কৃতি ছিল মজ্জাগত। কারণ সতীনাথের ঠাকুরমা ছিলেন বিশিষ্ট বাঙালী ঁরামতনু লাহিড়ির ভ্রাতুষ্পুত্রী। এ বিষয়ে সতীনাথের দাদা ভূতনাথ ভাদুড়ী জানিয়েছেন — "আমাদের পারিবারিক শিক্ষা ও কৃষ্টিতে উৎসাহিত করেছিলেন আমাদের ঠাকুমা— ঁরামতনু লাহিড়ীর ভ্রাতুষ্পুত্রী। কৃষ্ণনগরে ইংরাজী ধরণে শিক্ষার প্রচলন প্রথম দিকেই। আমাদের পারিবারিক Motto ছিল — 'Plain Living and high thinking'. "[১]

এরকম একটি পরিবেশে সতীনাথ বেড়ে উঠেছিলেন, সেখানে শিক্ষার প্রাধান্য সর্বাধিক। ছোটবেলা থেকেই সতীনাথ শারীরিক ভাবে একটু দুর্বল প্রকৃতির ছিলেন। তাই সংসারে অনেকগুলি সন্তানের মধ্যে থেকেও রাজবালা দেবীর সর্বদাই সজাগ দৃষ্টি ছিল তাঁর এই সন্তানটির ওপর। আর মায়ের এই স্নেহের সতীনাথের জীবনে একটি বিশেষ জায়গা ছিল। সতীনাথ ছেলেবেলা থেকেই বেশ চুপচাপ, মিতভাষী, বলা ভালো অন্তর্মুখী ছিলেন। তাই সকলের সঙ্গে থেকেও নিজের চারপাশে একাকিত্বের এটি বলয় তৈরী করে নিয়েছিলেন। ভাট্টাবাজারের উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সতীনাথের শিক্ষারম্ভ হয়। এরপর ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সতীনাথ পূর্ণিয়া জেলা স্কুলে ভর্তি হন। সতীনাথ ছিলেন স্কুলের একজন মেধাবী ছাত্র। নিয়ম-নিষ্ঠা, সদাচার এবং অধ্যাবসায়ের জন্য তিনি স্কুলের সকলের নজরে আসেন। শিক্ষক থেকে শুরু করে স্কুলের সকল ছাত্র-সহপাঠীরা তাকে বলত 'ক্লাস কি রশনি'। প্রত্যেক বছর ক্লাসের সকল ছাত্রকে পেছনে ফেলে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে পরের ক্লাসে উত্তীর্ণ হতেন। এই মেধাবী ছাত্রটি ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণিয়া জেলা স্কুলের নাম উজ্জ্বল ক'রে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পূর্ণিয়া জেলা স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করে সতীনাথ তাঁর দাদা ভূতনাথের প্রেরণায় বা ইচ্ছায় পাটনা কলেজে এসে বিজ্ঞান নিয়ে ভর্তি হন। তবে এবারে সতীনাথ অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারলেন না। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে সতীনাথ পাটনা সায়েন্স কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে আই. এস. সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর বিজ্ঞান শাখা ছেড়ে তিনি অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে পাটনা কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনার্স পাস করে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সতীনাথ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। স্নাতক পাশ করার পর সতীনাথের খুব ইচ্ছে ছিল বিলেতে গিয়ে পড়াশোনা করে আই. সি. এস. হবার; কিন্তু বাবা ইন্দুভূষণের অনুমতি না পাওয়ায় তাঁর ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে যায়। বরং বাবার ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিয়ে বা তাঁর আদেশকে মেনে নিয়ে সতীনাথ স্নাতকোত্তরের পর পাটনা কলেজে আইন নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন এবং ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে এল. এল. বি. পাশ করেন।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ সতীনাথের জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। একদিকে যখন বাবার প্রবল কর্তৃত্বের

চাপে নিজের স্বপ্ন ভঙ্গের যন্ত্রণা সতীনাথকে ভেতরে ভেতরে কুঁরে কুঁরে খাচ্ছে, তখন অন্যদিকে সতীনাথের জীবনে মর্মান্তিক আঘাত বয়ে আনে তাঁর মা রাজবালা দেবীর মৃত্যুসংবাদ (১৯২৮-এর ৪ঠা এপ্রিল)। বাবার সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই সতীনাথের একটা দূরত্ব ছিল। বাবা কখনই তাঁর খুব কাছের মানুষ হয়ে উঠতে পারেননি। তাঁর আশ্রয়-ভরসার একমাত্র জায়গা ছিল মা রাজবালা দেবী। অনেক একাকীত্বের মাঝে ওই একটি মাত্র স্থান ছিল সতীনাথের একেবারে নিজস্ব। সুতরাং সেই মায়ের মৃত্যুতে সতীনাথ শুধু মাতৃহারাই হন নি, তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ-নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছিলেন। সতীনাথের জীবনে আরও একবার দুঃসংবাদ বয়ে আনে তাঁর দিদি করুণাময়ীর মৃত্যু (১৯২৮ খ্রী.)।

বাবার আদেশকে শিরোধার্য করে সতীনাথ ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে এল. এল. বি. ডিগ্রী নিয়ে পূর্ণিয়ায় ফিরে আসেন এবং বাবার ইচ্ছেতেই পূর্ণিয়া আদালতের নামকরা আইনজীবী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের জুনিয়র হিসাবে কাজে যোগ দেন। মেধাবী ও মননশীলতার জন্য সেখানেও খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ নাম করে ফেলেন। আদালতে সকলেই তাঁকে স্নেহ-প্রীতি মিশ্রিত ভালোবাসায় গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তবে বাবার কথামত আইন-ব্যবসায়ে যোগ দিলেও সতীনাথ কোনদিন সেভাবে মক্কেল ধরা বা জমিয়ে প্র্যাকটিস করার দিকে ঝোঁকেন নি। বরং আদালতে ঢুকে বার লাইব্রেরীতে গিয়ে বই-এ মুখ গুঁজে পড়ে থাকতেন। তবে শুধু আইন সংক্রান্ত বই নয়, যে কোন ধরনের বই পড়তেই সতীনাথ ভালোবাসতেন। সতীনাথের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ব্যবহারজীবী হবার সম্ভাবনা অনেকেই লক্ষ করেছিলেন। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ হিন্দি সাহিত্যিক ফণীশ্বরনাথ রেনুর উক্তি উল্লেখযোগ্য — ''বাবা আরও অনেক কথা বলতেন ছোটবাবুর সম্বন্ধে। ছেলে হয় তো ছোটবাবুর মতন একটুও মেজাজ বা বিদ্যার 'ঘমণ্ড' (দেমাক) নেই। অযথা কোনো কথা বলেন না। ওকালতি পড়বার সময়েই ওঁর তৈরী করা 'মিশিল' পড়ে পূর্ণিয়ার 'বার লাইব্রেরী'-তে সিনিয়ার উকিলেরা 'দাঁতের তলায় আঁগুলি' দিতেন — 'এ তো আর একটা ইন্দুবাবু তৈরী হয়ে গেছে।' '' [২] আইন ব্যবসায় অল্পসময়ের মধ্যে সাফল্য অর্জন করেও, সতীনাথ ওকালতিকেই জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে বেছে নিয়েও তাকে সারাজীবন ধরে রাখলেন না। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ওকালতি জীবনকে সমাপ্ত করে জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু করেন।

১৯৩৯ সালটি সতীনাথের জীবনের পর্বান্তরের কাল। এই বছরই সতীনাথ নিজের জীবনের দু-দুটো বড় বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, অথচ দুটোর কোনটিতেই ছিল না কোন আগাম পূর্বাভাস। ১৯৩৯-এ প্রথমে তিনি নিজের ওকালতি পেশা থেকে চিরদিনের মতো বিদায় নেন। আর দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি আরও অনেক বেশী চমকপ্রদ। কাউকে কিছু না জানিয়ে ১৯৩৯ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর সতীনাথ মহাত্মাজীর আদর্শবাদী পার্টি কংগ্রেসে যোগ দিয়ে নিজের রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত করেন। সতীনাথের এই রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার পর সমস্ত পূর্ণিয়াবাসী যেন বিস্মিত হয়েছিলেন।

সকলের মনেই প্রশ্ন জাগছিল — সতীনাথ কী কোনও পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই শুধুমাত্র হঠকারিতা করে রাজনীতিতে এলেন? যাঁরা তাঁকে জানতেন-চিনতেন, তাঁদের বিশ্বাস ছিল — চিরকালের ধীর-স্থির-শান্ত-স্থিতধী এই মানুষটি কোনও হঠকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। নিশ্চয়ই কোনও মহৎ ও বড় উদ্দেশ্য নিয়েই সতীনাথ রাজনীতির অঙ্গনে পা রেখেছিলেন। ছাত্র জীবন থেকেই সতীনাথ অনেক সমাজসেবা-সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। ১৯৩১ সালে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রী বিভূবিলাস ভৌমিককে লেখা একটি চিঠি থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায় — "নেহাৎ লোকের দিন কাটে ব'লেই আমার দিন কাটছে, এ কথা বললে একটু অত্যুক্তি করা হয়, তবে আমার কাটচে এই শতকরা ৮০ জন লোকের সাধারণ বৈচিত্র্যহীন ভাবে যে রকম করে কাটে। Daily Routine বলচি — ৭টা থেকে ৯টা good boy — আইন পাঠ। ৯টা থেকে বারোটা কেদার বাঁড়ুয্যে সাহিত্যিকের বাড়ী আড্ডা। খাওয়া দাওয়ার পর ছোট্ট একটী ঘন্টা তিনেকের ঘুম। ঘুম থেকে উঠে চা পানের সঙ্গে খবরের কাগজ পাঠ। তারপর সান্ধ্যভ্রমণ। তারপর নটা রাত পর্যন্ত বাজী রেখে Bridge খেলা, রাতে খাওয়া দাওয়ার পর সাহিত্য চর্চা। নবশক্তি পড় না বোধ হয় — ওতে আমার লেখা গোটাকয়েক Satire বেরিয়েচে। এখন দ্বিগুণ উৎসাহে লিখচি। হ্যাঁ ব'লতে ভুলে গিয়েছি, এছাড়া একটু ড্রয়িংও ক'রচি। নমুনা পাঠালাম। এই হচ্ছে বাঁধা routine। এছাড়া বাহাদুরী আর বাহবা নেবার জন্য কতকগুলি public activity দেখাচ্চি। টুলের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা মেরেচি। একটা public trust fund দেখবার জন্যে এখানকার লোকেদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হ'য়েচি। পূজোয় বলি তুলবার জন্যে mass meeting আহ্বান করচি। বাড়ী এসে নিজেরই হাসি আসে এ সব তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামানোর জন্যে।" [৩] তাঁর এই অন্তরঙ্গ বন্ধুটিকেও সতীনাথ তাঁর প্রকৃত মনের হদিশ কোথাও দেন নি। দীর্ঘ এই চিঠির এত বিস্তারিত কথার মধ্যে কোথাও তিনি ভুলক্রমেও উল্লেখ করেন নি তাঁর অন্তর্মনের প্রাক্-প্রস্তুতির কথা। এছাড়া তাঁর পরিবারেরও কেউ কোন আভাস পান নি তাঁর রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে। এমন কী দাদামশাই কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁর কাছে সতীনাথ প্রত্যহ যেতেন এবং তিনি ছিলেন দাদামশাইয়ের অত্যন্ত কাছের মানুষ। তবু সেই মানুষটিও সতীনাথের কংগ্রেসে যোগদানের কথা শুনে লিখেছেন —

"২৭-৯-১৯৩৯ — কাল কে বললে — সতু টিকাপট্টি গিয়েছে। Law Practice ছেড়ে দিলে। কথাটা বিশ্বাস হয় নি। আজ শুনছি সত্যই সে Congress -এর কাজ করবে, তাই গিয়েছে। ওরূপ intellect -এর ছেলে, চাকরী কি Court attend করতে উৎসাহ পায় না। তারা বরাবর বড় aspiration পোষণ করে, সাধারণে যা করে তাতে মন বসে না। কিন্তু Congress Circle -এই বা তার মন তুষ্ট থাকবে কি করে? সে হল একটি ক্ষুরধার intellect -এর ছেলে, সত্যপ্রিয়, বিদ্যাপ্রিয়, sincere কিন্তু ও Circle -এ যে প্রায়ই মূর্খ মিথ্যাভাষীর সঙ্গ জুটবে। মনের মতো দোসর বা বন্ধু পাবে না। কারো সঙ্গে বনবে না, কি করে কাটবে! সে নিশ্চয়ই একটা কিছু স্থির করে গিয়েছে। তা হলেও একজনও নিজের মত খাঁটি লোক না পেলে, ভাল লাগবে

কেন; কাজ হবে কেন? ভগবান তাকে সাহায্য করুন, সে যেন মনের মত এক মতের লোক পায়।" [৪]

সতীনাথ ছিলেন সম্ভ্রান্ত ভদ্র ঘরের সন্তান। ছোটবেলা থেকেই বেশ রাজকীয় ভাবেই মানুষ হয়েছেন এবং বড় হয়েও যে জীবন তিনি অতিবাহিত করেছেন তা ছিল বেশ আয়েসী ও বিলাসবহুল। কিন্তু যে দিন সতীনাথ টিকাপট্টি আশ্রমে গিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন, সেদিন থেকেই সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারায় পরিবেষ্টিত নিরুপদ্রব সচ্ছল পারিবারিক জীবনের বন্ধনকে ছিন্ন করে, গান্ধীবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পরিধেয় হিসেবে তুলে নিয়েছিলেন খাটো ধুতি, দু-পকেটওয়ালা হাফ হাতার জামা, আর পায়ে চপ্পল। পূর্ণিয়ার এই টীকাপট্টি আশ্রম পরিচালনা করতেন গান্ধীবাদী নেতা বিদ্যানাথ চৌধুরী। বোধহয়, এই মানুষটির আদর্শবাদের দ্বারাই সতীনাথ প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কংগ্রেসে তথা রাজনীতির জগতে আসার সংকল্পকে সিদ্ধান্তে পরিণত করেছিলেন। তবে একথাও ঠিক যে, সত্যনিষ্ঠ, আদর্শপ্রিয় সতীনাথ কেবল অন্যের অনুপ্রেরণায় রাজনীতির জগতে আসেন নি। এর পেছনে ছিল তাঁর গভীর চিন্তা ও ভবিষ্যতের কোনো সু-বৃহৎ পরিকল্পনা। সতীনাথ যে ছোটবেলা থেকে বেশ অন্তর্মুখী ছিলেন সেকথা আমাদের জানা। তিনি খুব সহজেই সকলের সঙ্গে মিশে যেতে পারতেন না, সকলকে নিজের মনের কথাও বলতে পারতেন না। তাই হয়ত মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের জন্য, সমাজের ভালোমন্দ সবকিছু নিজের চোখে যাচাই করে নেবার জন্য, তাঁর প্রাণপ্রিয় শহর পূর্ণিয়ার সকল স্তরের মানুষের জীবনের খুঁটিনাটি সব কিছু সম্পর্কে জানার জন্য, অর্থাৎ হাতে-কলমে কাজ করে প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সর্বোপরি 'জীবনে-জীবন যোগ' করার জন্য তিনি রাজনীতির আসরে নেমেছিলেন।

রাজনীতিতে যোগ দিয়ে সতীনাথ আপাদমস্তক কাজে ডুবে যান। সাধারণ মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। এত দিনের আরাম-আয়েস-বিলাসকে ত্যাগ করে এই কৃচ্ছসাধনার পথের সঙ্গে তিনি খুব সহজেই মানিয়ে নিয়েছিলেন। দাদামশাইয়ের লেখা ডায়ারী থেকে সে প্রমাণও আমরা পেয়ে যাই — "২৯-৯-১৯৩৯ — প্রিয় ভূতনাথ দেখে এসেছে যে প্রিয় সতীনাথ ভাল আছে। বেশ ফূর্তিতে আছে। আশ্রমটি ভাল, কোনো কষ্ট নেই, এখন কংগ্রেস স্কুলের কাজ করছে, training দিচ্ছে। সম্ভবত ১৪ই, ১৫ই অক্টোবর বাড়ীতে দেখা করতে আসতে পারে। শুনে প্রাণটা অনেক খানি শান্ত হল।

৩০-৯-১৯৩৯ — প্রিয় ভূতনাথের সঙ্গে খোকার দোকানে দেখা হল। সতীনাথকে দেখে এসে তার জন্য ভাবনা কমে গিয়েছে। সে ভালই আছে। প্রথম শুনে সত্যই বড় কষ্ট হয়েছিল — তার মনের মতো সঙ্গ পাবে না এই ভয়ে। এখন ভাবছি — যে সে সকল বিষয়ে যথেষ্টই বোঝে এবং শেষ পর্যন্ত ভেবে নিয়ে এ কাজ করেছে; adopt করে নেবার শক্তি নিশ্চয়ই রাখে। Risk না নিলে কোনো বড় কাজ হয় না।" [৫]

সতীনাথ সত্যিই Risk নিতে জানতেন এবং সব বাধা পেরিয়ে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারতেন। আর তাইতো অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক ভাবাদর্শ সকলকে অনুপ্রাণিত করতে

LIBRARY
27 MAY 2016
279007

শুরু করে। কংগ্রেস কর্মীদের অনেকেই সতীনাথের সরল ও অনাড়ম্বর জীবন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর মত জীবন যাপন শুরু করেন। সতীনাথ কংগ্রেসে যোগ দিয়ে আশ্রমের কর্মীদের সকলের সঙ্গে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে গেলেন এবং দেশের কাজে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে উৎসর্গ করে দিলেন। কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো গরুর গাড়িতে করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে জনমানুষের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তেলেন এবং তাঁদেরকেই দেশসেবার কাজে অনুপ্রাণিত করেন। সতীনাথের সময়ে আরও কয়েকজন বাঙালী যাঁরা রাজনীতিতে যোগদান করেছিলেন, যেমন — শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ রায়, শ্রী কিশোরীলাল কুণ্ডু প্রমুখ — কিন্তু এঁরা প্রত্যেকেই বিবাহিত হওয়ায় সম্পূর্ণভাবে নিজেদেরকে দেশের কাজে নিয়োজিত করতে পারেন নি। কিন্তু সতীনাথ ছিলেন অকৃতদার মানুষ; গান্ধীজীর আদর্শবাদিতায় কংগ্রেসে যোগদান করে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দেশ-দশের সেবায় নিয়োজিত করে দেন। তবে দেশসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেও সতীনাথ কখনো তাঁর কর্তব্যবোধ থেকে বিচ্যুত হন নি। দেশের কাজ করার মাঝে অবসর সময়ে তিনি বাড়িতে গিয়ে বৃদ্ধ পিতাকেও দেখে আসতেন।

সতীনাথ যে সময় রাজনীতিতে যোগদান করেছিলেন, সেইসময় ভারতবর্ষ সহ বাংলার ইতিহাসের এক দারুণ বিপ্লবের কাল। ১৯৩৯-এর ১লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হলে ভারতের জাতীয় রাজনীতি আবার একটা সংকটের মুখে এসে পড়ে। ফ্যাসিবাদী ইতালী, জার্মানি ও জাপান প্রমুখের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের অন্যতম দেশ হিসেবে ইংল্যাণ্ড এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। আর এরপরই ভারতবর্ষের তৎকালীন শাসক কর্তা ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস কিংবা কেন্দ্রিয় আইন সভার নির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে কোনরকম আলোচনা না করেই ভারতকে 'যুদ্ধে রত' দেশ বলে ঘোষণা করেন। কংগ্রেসও ব্রিটিশ সরকারের এই সিদ্ধান্তকে শিরোধার্য করে প্রাথমিক ভাবে এই বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষকে সমর্থন জানায় এই আশায় যে, ব্রিটিশ সরকার ইউরোপের মতো ভারতেও গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার বাতাবরণ তৈরী করতে উদ্যোগী হবে। আর এই আশাতেই বোধহয় গান্ধীজী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই আবেগপূর্ণ ভাবে বলেছিলেন — "আমি মিত্রশক্তির কাজকর্মে সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল এবং ব্রিটিশের সঙ্গে পুরোপুরি ও নিঃশর্ত সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক।" [৬] বলাবাহুল্য গান্ধীজী তাঁর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে নিজের এবং অনান্য সমস্ত পার্টির দলীয় নেত্রীবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করেই করেছিলেন। গান্ধীজীর এই ঘোষণার পরই তাঁর সঙ্গে অন্যদের একটা মতভেদ দেখা দেয়। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গান্ধীজী ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণকে ইংল্যাণ্ডের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানালে, সেই সভার বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি সুভাষচন্দ্র বসু তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, এই যুদ্ধে জার্মান ও ইতালী সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্যেই যুদ্ধে নেমেছে। আর ইংল্যাণ্ডও একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ, তাই তাকে সমর্থন করার কোন

যুক্তিই নেই। জহরলাল নেহেরু, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ সকলেই সুভাষচন্দ্র বসুকেই সমর্থন করেন। এরপর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে — ব্রিটেনকে ভারতবাসীর স্বাধীনতার দাবী নীতিগত ভাবে গ্রহণ করে প্রমাণ করতে হবে যে, ব্রিটেন প্রকৃতই গণতন্ত্রের রক্ষক এবং যুদ্ধের শেষে কীভাবে ভারতের স্বাধীনতাকে কার্যকর করা হবে তার একটা রূপরেখাও স্পষ্ট ভাবে ব্রিটেনকে জানাতে হবে। এই শর্ত মেনে নিলে তবেই ভারত এই যুদ্ধে ব্রিটেনের স্বপক্ষে সহযোগিতা করবে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়া ছিল নেতিবাচক। ফলে তা কংগ্রেস নেতৃত্ব ও অন্যান্য ভারতবাসীর মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এর ফলশ্রুতিতে কংগ্রেস নেতৃত্ব মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে মন্ত্রীসভা থেকে সরে এলেও কংগ্রেস সেই মুহূর্তেই কোনও গণ আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করেনি। কারণ — কংগ্রেস তখনও বিশ্বাস করত, ব্রিটেন ও ফ্রান্স গণতন্ত্রের পক্ষেই যুদ্ধ করছে। তাছাড়া তখন ভারতে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কও ছিল বেশ তিক্ত।

এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তি জার্মানীর কাছে মিত্রশক্তি বিপর্যস্ত হতে শুরু করে। নাৎসী বাহিনী ইউরোপ আক্রমণ করলে ফরাসী বাহিনীর পতন ঘটে। এমতাবস্থায় ১৯৪০ সালে রামগড় অধিবেশনে কংগ্রেস আবার পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে। কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল কংগ্রেসের দাবী মানতে অস্বীকার করে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৪০-এর অক্টোবর মাসে কংগ্রেস নেতৃত্ব ব্যক্তিগত আইন অমান্যের কর্মসূচী গ্রহণ করে। ব্রিটিশ সরকারও প্রায় ২৫ হাজার সত্যাগ্রহীকে কারারুদ্ধ করে কংগ্রেসের কাজের প্রত্যুত্তর দেয়।

অন্যদিকে ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেও বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কংগ্রেসের মূল প্রতিপক্ষ মুসলিম লীগ ও ব্রিটিশ সরকারের 'আগস্ট অফার'কে প্রত্যাখ্যান করে। কমিউনিষ্টরা ভারতবর্ষকে এই যুদ্ধে জড়ানোর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তারা স্লোগান তোলে 'না এক পাই না এক ভাই'। অর্থাৎ এই বিশ্বযুদ্ধে ভারত ব্রিটিশ সরকারকে এক পয়সা দিয়ে এবং একজন মানুষ দিয়ে সাহায্য করবে না। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি প্রথম থেকেই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নিঃশর্ত বিরোধিতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সব মিলিয়ে ভারতীয় সমূহ রাজনীতিতে বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে এক ভয়াবহ বিপর্যস্তের টানাপোড়েনের কাল চলছিল। চারিদিকেই ভাঙ্গন আর টাল-মাটাল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হতে হতে ভারতবর্ষ এগিয়ে চলছিল।

ভারতীয় রাজনীতির এক অগ্নিময় মুহূর্তে সতীনাথ ভাদুড়ী রাজনীতিতে যোগদান করেছিলেন। এই রাজনীতিতে যোগদান করে তাঁর প্রথম কাজ হয়েছিল জীবনে জীবন যোগ করা, জন সংযোগ তৈরী করা, ইংরেজদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ জনমত গড়ে তোলা। আর বলা বাহুল্য, সতীনাথ এ কাজে খুব অল্পসময়ের মধ্যেই সফলতা পেয়েছিলেন তাঁর স্নিগ্ধ স্বভাবের গুণে। সতীনাথ ছিলেন সকল কাজে আগ্রহী, বক্তৃতায় পটু, বুদ্ধিতে বিচক্ষণ এবং সংকল্পে দৃঢ় আর প্রকৃত নির্লোভ ব্যক্তিত্ব।

আর সতীনাথের মধ্যে ছিল না কোন গোড়াঁমি; তিনি কেবলমাত্র সংগ্রামের লক্ষ্য অনুযায়ী তাঁদের কর্মপদ্ধতিকে সংহত-বলিষ্ঠ করে তুলতে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। সতীনাথ ছিলেন রাজনীতির একজন স্থিরচিত্ত সাধক; তাই রাজনীতির জগতে পা দিয়ে তিনি মন প্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি। সক্রিয় ভাবে তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তাই রাজনীতিতে যোগদান করে সতীনাথ তিন তিনবার কারাবরণ করেন। প্রথমবার ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের জন্য সতীনাথ প্রথমে পূর্ণিয়া জেলে কারারুদ্ধ হন, তারপর সেখান থেকে হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। এই হাজারিবাগ জেলে থাকাকালীনই সতীনাথের সঙ্গে পরিচয় হয় পুরুলিয়ার ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত ও তাঁর পুত্র বিভূতি দাশগুপ্তের সঙ্গে। এছাড়া পরিচয় হয় বিহারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, শ্রী অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ এবং শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ সহায় প্রমুখ মন্ত্রীগণের সঙ্গে। এই হাজারিবাগ জেলে সতীনাথ নিজেকে ভেতর থেকে আরও নতুন করে, নতুন ভাবে গড়ে তুলতে শুরু করেন। এখানেই তিনি তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' পড়েন। এবারে তাঁর কারাজীবন খুব বেশী দীর্ঘ হয়নি; অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ছাড়া পেয়েছিলেন। সতীনাথ তখন পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক। আর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহী হিসেবে তাঁর কাজ হয়েছিল মূলত জনসংযোগ ও জনমত গড়ে তোলা যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারত ব্রিটেনকে কোনরকম ভাবে সাহায্য করবে না, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে। তাই জেল থেকে ছাড়া পাবার পরও সতীনাথের সেই জনসংযোগের কাজ বজায় থাকে। পূর্ণিয়ার গ্রামে- গঞ্জে গিয়ে সভা করতে থাকেন। আর এই ভাবেই সতীনাথ পূর্ণিয়ার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার কাছে 'ভাদুড়ীজী' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। কংগ্রেসের সংগঠনকে আরও মজবুত করে ছোট ছোট দলে ভাগ করে সতীনাথ তাদের জন্য পার্টির ক্লাস নিয়ে তাদেরকে রাজনৈতিক আদর্শে শিক্ষিত, দৃঢ় ও সচেতন করে তুলতে চেষ্টা করেন। এই ভাবেই পার্টির কাজে, দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করে ভাদুড়ীজী দিনাতিপাত করতে থাকেন। আর মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে ফাঁকে বৃদ্ধ পিতাকে দেখে আসতেন। সতীনাথের এই রাজনৈতিক জীবনে তাঁকে দ্বিতীয়বার কারারুদ্ধ হতে হয় ১৯৪১ সালে। এবারে তাঁর কারাজীবনের মেয়াদ হয়েছিল ছয় মাস।

এরপরই ১৯৪২ সাল, ভারতীয় রাজনীতির অগ্নিমুহূর্ত। বিহার-বাংলা সহ গোটা ভারতবর্ষেই ছড়িয়ে পড়েছে গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ডাক। আপস্ মিশনের ব্যর্থতার পর নেহেরু, গান্ধীজী সহ দেশের ফ্যাসী বিরোধী নেতৃত্বরা বুঝতে পারেন যে, গণ আন্দোলন ছাড়া ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে কোনো সম্মানজনক মীমাংসা আশা করা নিরর্থক। এছাড়া যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি জাতীয় নেতৃত্বকে আন্দোলনমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। এর ওপর আবার ভারতে জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠায় দেশের জনসাধারণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল।

এমতাবস্থায় গান্ধীজী ১৯৪২ সালের মে-জুন মাসে 'হরিজন' পত্রিকায় ঘোষণা করেন যে — এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের উপস্থিতি জাপানকে ভারত আক্রমণ করতে প্ররোচিত করবে। তিনি আরও বলেন যে, ভারতবাসী এখন নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে সক্ষম, তাতে ব্রিটিশ সরকারের সাহায্যের কোন দরকার নেই। তাই ইংরেজ সরকারকে ভারত ত্যাগ করে যেতে হবে। গান্ধীজীর এই চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করেই ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয় 'ভারতছাড়' আন্দোলন। ১৯৪২-এর ১৪ই জুলাই ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজীর সঙ্গে সহমত পোষণ করে 'ভারতছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য বোম্বের গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ককে এ. আই. সি. সি-র অধিবেশন ডাকা হয় এবং সেখানে আলোচনা হয় যে, কেবল ভারতবর্ষের স্বার্থেই নয়, নাৎসিবাদ প্রভৃতি সকল রকম সাম্রাজ্যবাদী কাজের অবসানের জন্যও ভারতবর্ষেইংরেজ শাসনের অবসান হওয়া প্রয়োজন। তবে ভারত এর জন্য মিত্রপক্ষকে কোনভাবে বিব্রত করবে না। এই অধিবেশনে গান্ধীজী সকল দেশবাসীকে আশ্বস্ত করতে ঘোষণা করেন যে — ''আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আমি আর কোনো কিছুতেই সন্তুষ্ট হব না।'' [৭] তিনি এও জানান যে, ইংরেজ সরকার যদি কংগ্রেসের দাবি অগ্রাহ্য করে তবে স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষার জন্য কংগ্রেস দেশব্যাপী গণ আন্দোলনে নামবে।

গান্ধীজীর এই 'ভারতছাড়' প্রস্তাব সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারও কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তৎকালীন বড়লাট লিনলিথগো গান্ধীজীর প্রেরিত বিশেষ দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করে জানিয়ে দেন যে — যুদ্ধ চলাকালীন অহিংস অথবা সহিংস যে কোনরকম আন্দোলনই সরকার কখনো বরদাস্ত করবে না। বড়লাটের এই ঘোষণার পর ১৯৪২-এর ৭ই আগষ্ট গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারাভারত কংগ্রেস কমিটি ব্যাপকভাবে অহিংস গণ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গান্ধীজী ঘোষণা করেন — ''আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হব না। আমরা দেশকে স্বাধীন করব নয়তো ঐ প্রচেষ্টায় মৃত্যুবরণ করব।'' [৮] "We shall do or die. We shall either free India or die in the attempt." [৯] ব্রিটিশ সরকারও কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। ফলত ৮ই আগষ্ট মধ্যরাত্রে গান্ধীজী, মৌলনা আজাদ সহ অন্যান্য শীর্ষ কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করে এবং জাতীয় কংগ্রেসকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে। ৯ই আগষ্ট গান্ধীজী ও অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের গ্রেপ্তারের খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লে ভারতবাসী ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং স্বতস্ফূর্ত ভাবে প্রতিবাদ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সারা দেশ জুড়ে শুরু হয়ে যায় 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। সভাসমিতি, শোভাযাত্রা, হরতালের মধ্য দিয়ে ভারতবাসী প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। গান্ধীজী সহ অন্যান্য নেতাদের মুক্তির দাবিতে তারা সরব হয়ে ওঠে এবং আন্দোলন ধীরে ধীরে অহিংস থেকে সহিংস রূপ নেয়। অন্দোলনকারীরা রেললাইন তুলে ফেলে, টেলিগ্রাফের তার

ছিঁড়ে ফেলে, রেলস্টেশন তছরূপ করে, সরকারী দপ্তরে ভাঙচুর করে, কোথাও কোথাও আগুন লাগিয়ে দিয়ে তীব্র প্রতিবাদ করে। সারা দেশজুড়ে ছাত্ররাও 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সমর্থনে স্কুল ও কলেজে ধর্মঘট পালন করে।

গান্ধীজীর এই 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল বিহার ও উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলেও। দেশের অন্যান্য প্রদেশের মতো বিহারের পূর্ণিয়াতেও জনগণের মধ্যে অগ্নিসংযোগ হয়েছিল 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ডাকে। সতীনাথ ছিলেন সেইসময় পূর্ণিয়ার জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারী। তাই স্বভাবতই পূর্ণিয়া জেলার আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হল তাঁর উপর। নিজের ওপর ন্যস্ত কর্তব্যকে যথাযথ ভাবে পালন করতে তৎপর সতীনাথ এই সময় নানাভাবে সংগঠনের কাজ করেছেন। কখনো নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাতের অন্ধকারে পুলিশের চোখ এড়িয়ে রাতের ট্রেনে চেপে কোনো দূরবর্তী স্থানে গিয়েছেন সংগঠনের কাজ করতে। আবার কখনো মাইলের পর মাইল পথ পায়ে হেঁটে, গভীর জঙ্গলের অন্ধকারে সভা-সমিতি করেছেন, কখনো বা সংগঠনের কর্মীদের কাছে অস্ত্র পৌঁছে দিয়েছেন। তারপর পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেসের নেতা রূপে হাজার হাজার সংগ্রামী-স্বাধীনতাকামী মানুষের সঙ্গে ১৯৪২-এর ১৫ই আগষ্ট পূর্ণিয়া সেন্ট্রাল জেলে বন্দী হয়েছেন। এবারে সতীনাথের কারাজীবন দীর্ঘায়িত হয়েছিল। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত সতীনাথ কারারুদ্ধ ছিলেন। পূর্ণিয়া সেন্ট্রাল জেলে বন্দী থাকাকালীন একদিন সত্যাগ্রহীরা দল বেঁধে জেল গেট ভাঙার চেষ্টা করে এবং সেই দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন সতীনাথ। জেল ভাঙার চেষ্টার অপরাধে পুলিশ লাঠি চার্জ করে এবং তাতে সতীনাথ গুরুতর ভাবে আহত হন। তারপর সতীনাথ পূর্ণিয়া সেন্ট্রাল জেল থেকে চালান হয়ে যান ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলে। ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলে সতীনাথ থাকতেন 'নয়াগোল' নামক ওয়ার্ডে। সেখানে সতীনাথ সারাদিন পড়াশুনা নিয়েই থাকতেন, আর মাঝে মাঝে কি যেন লিখতেন। তবে পড়া-লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও সতীনাথ তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত ছিলেন না। জেলে রাজবন্দিরা ঠিক করে যে, তারা ছাব্বিশে জানুয়ারী পালন করবে। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ তা কিছুতেই হতে দেবেন না; তারা খানাতল্লাশি চালিয়ে বন্দীদের কাছ থেকে সবরকম উপকরণ কেড়ে নেয় এবং সেই সঙ্গে জানিয়ে দেয় যে জেলের মধ্যে বন্দীরা যদি কোনরকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাহলে পুলিশ লাঠি চার্জ করে তা বন্ধ করে দেবে। কর্তৃপক্ষের এই আগাম চোখ রাঙানিতে কোন ফল হল না। জেলে বন্দীদের মধ্যে যাঁরা নরমপন্থী বা গান্ধীবাদী ছিলেন তাঁরা যদিও ভেবেছিলেন কোনো রূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে শুধুমাত্র চরকা চালিয়েই ২৬শে জানুয়ারী পালন করবে। কিন্তু রাজবন্দীদের মধ্যে থেকে তরুণরা তাতে বাদ সাধল, তারা সারি সারি করে দাঁড়িয়ে জেলের মধ্যেই 'বন্দেমাতরম্' গাইতে শুরু করল। আর এই 'বন্দেমাতরম্'-এর সুর ছুঁয়ে গেল লেখায় মগ্ন ভাট্টাবাজারের সেই পিকেটের যুবকটিকেও। তিনিও

তখন কলম ফেলে রেখে উঠে এসে 'বন্দেমাতরম্' সুরে গলা মেলান। সতীনাথের সাহিত্যিক শিষ্য ফণীশ্বর নাথ রেণুর লেখায় উঠে আসে সেই ইতিহাস — "আমরা আমাদের কার্যক্রম সম্পন্ন করবার যোগাড়ে ব্যস্ত থাকলাম। আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে প্রথমে কয়েকটা 'স্লোগান' দিলাম। তারপরে বন্দেমাতরম্ গান আরম্ভ করলাম। আমাদের প্রথম জয়ধ্বনি শুনে ওয়ার্ডের বাইরে ওয়ার্ডারদের 'অফিসর' একটা বিকট চিৎকার করে কোনো অর্ডার দিল। গান্ধিবাদী নেতারা মেঝেতে কম্বল পেতে বসে বসে 'চরখা' চলাতে থাকলেন। ওয়ার্ডারদের 'কুইকমার্চ ...' বুটের আওয়াজ আমাদের ওয়ার্ডের বাইরে শোনা যাচ্ছে। ঠিক সেই সময় ভাদুড়ীজী লেখার থেকে উঠে সোজা আমাদের প্রথম সারিতে এসে দাঁড়ালেন।" [১০] এই ভাবেই সতীনাথ জেলের ভেতরেও নেতৃত্ব দান করেছিলেন তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামী সহকর্মীদের, সহবন্দীদের।

তবে সতীনাথ সব কাজে জেলবন্দীদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করলেও তাঁর একটা একান্ত নিজস্ব জগৎ ছিল। সেখানে তিনি ছিলেন একদম একা। বলা যেতে পারে এই জেল জীবনই একভাবে সতীনাথের ধ্যানযোগের সময়। কারণ তিনি যত বেশি দেখতেন-শুনতেন, তত কম কথা বলতেন। জেলের মধ্যেও যেন তিনি স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছিলেন। জেলের টি সেলে থাকার জন্য সতীনাথ জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে অনুরোধ করে বলেছিলেন — "সাহেব! আপনাদের টি. সেলের 'ডিগ্রি' গুলো তো খালি আছে, — ওখানে আমাদের রাখা যায় না? ইংরেজ সুপার অবাক হয়ে একবার ভাদুড়ীজীর দিকে তাকালেন .... নিজের ইচ্ছেয় সেলে থাকতে চায়। এ কেমন প্রিজনার রে বাবা! বললেন — 'আমরা জোর করে কাউকে ওখানে পাঠাতে পারি না। তবে স্বেচ্ছায় যারা ওখানে যেতে চায় তাদের ওখানে ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে। ..... কিন্তু, নিজেকে নিজেই এই দণ্ড কেন দিতে চাইছেন, বুঝতে পারলাম না।' " [১১] পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে সতীনাথের এই স্বেচ্ছা নির্বাসন শাস্তি বলে মনে হলেও, সতীনাথের কাছে তা ছিল উপনয়ন গৃহ। ঐখানে বসেই দিন রাত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলতে থাকে তাঁর সাহিত্য সাধনা তথা সাহিত্যিক জীবনের প্রস্তুতি পর্বের অধ্যবসায়। এই সেলে বসেই সতীনাথের সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল। এখানেই তিনি লিখেছিলেন তাঁর প্রথম এবং অনবদ্য উপন্যাস 'জাগরী' (১৯৪৫খ্রী.)। 'জাগরী' রচনা সম্পর্কে রেণু তাঁর 'ভাদুড়ীজী' প্রবন্ধে লিখেছেন — "একদিন ওঁর 'ডিগ্রি'তে বসে চা খাচ্ছিলাম। সামনে একটা খাতা ছিল। হাতে নিয়ে পাতা খুলে দেখি লেড পেন্সিল দিয়ে লেখা। পড়তে পড়তে হঠাৎ মনে হল — এতো ডায়েরি। খাতা বন্ধ করে রেখে দেবার সময় বললাম — 'ডায়েরি বুঝি?' প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উনি বললেন — 'কেন? ডায়েরি পড়তে নেই কারও বুঝি? আর বাকি সব কিছুই না বলে পড়া যায় কি?' আমি অপ্রস্তুত এবং লজ্জিত হয়ে চলে আসছিলাম। বললেন — 'চারপাতা যখন পড়েই ফেলেছো বাকি পৃষ্ঠাগুলোও পড়ে নাও। কিন্তু তোমাদের — 'গাববে-হাউসে' এর চর্চা বা আলোচনা করা চলবে না। নিয়ে যাও।' সেই টি-সেলে বসে 'জাগরীর' পাণ্ডুলিপি পড়বার কথা চিরদিন মনে থাকবে।" [১২]

এইবার সতীনাথের কারাবাস বেশ দীর্ঘ হয়েছিল। মাঝখানে একবার বাবার অসুস্থতার জন্য

ছাড়া পেয়েছিলেন মাত্র দশ দিনের জন্য। সেই সময় পূর্ণিয়ায় এসে মৃত্যু পথযাত্রী বাবাকে দেখে শেষবারের মতো গিয়েছিলেন। তবে ১৯৪৪ সালে ২০শে জানুয়ারী যেদিন তাঁর পিতার মৃত্যু হয় সেদিন সতীনাথ ছিলেন জেলে। ১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি সতীনাথ জেল থেকে ছাড়া পান। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সতীনাথ সরাসরি পূর্ণিয়ায় ফিরে আসেন এবং আবার কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। নিজের অসমাপ্ত কাজকে সম্পন্ন করার জন্য সতীনাথ এবার পূর্ণিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ছুটে বেড়িয়েছেন। পূর্ণিয়ার গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষের মধ্যে প্রচার করেছেন গান্ধীজীর নীতি ও মতাদর্শকে। যোগাযোগ করেছেন পূর্ণিয়ার 'আজাদ দস্তা' পার্টির সঙ্গে। কাটিহার জুটমিলের শ্রমিকদের ধর্মঘটের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে তাদের দাবী-দাওয়াকে আরও জোরাল করে তুলেছেন। এছাড়া 'ন্যাশনাল ওয়ারফাণ্ড'-এ জোর-জুলুম করে চাঁদা তোলার প্রতিবাদে নিজের মতামত জানিয়ে চিঠি লিখেছেন 'সার্চলাইট' পত্রিকায়। সতীনাথ এই সময় পুরোদস্তর পার্টির কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। নিজের বাড়িকেও করে তুলেছিলেন কংগ্রেসের কার্য্যালয়। সারাদিন ও রাত তাঁর বাড়িতে কংগ্রেস এবং অন্যান্য পার্টির লোকদের আনাগোনা চলত এবং সতীনাথ তাদের জন্য যথেষ্ট আশ্রয় ও আপ্যায়নের ব্যবস্থাও করতেন। ফনীশ্বরনাথ রেণুর লেখায় উঠে এসেছে সেই কথাও — "রাজেন্দ্র বাবু সারা বিহার সফরে বেরিয়েছেন — পীড়িত রাজনৈতিক কোষের তহবিলের টাকা তুলবার জন্য। পূর্ণিয়াতে ওঁর থাকবার ব্যবস্থা ভাদুড়ীজীর বাড়িতে করা হয়েছিল।" [১৩]

গোটা পূর্ণিয়া জেলার প্রত্যেকটি মানুষের সঙ্গেই সতীনাথের ছিল গভীর সম্পর্ক। কংগ্রেস-অকংগ্রেস, ধনী-দরিদ্র, সৎ-অসৎ নির্বিশেষে সতীনাথ মানুষের সঙ্গে মিশেছিলেন। বুঝে নিতে চাইছিলেন তাদের মনের কথা — তাদের চিন্তার জগতের গতিবিধি। কারণ এরাই তো একদিন সতীনাথের সাহিত্যের মুখ্য চরিত্র হয়ে ওঠে। আসলে পূর্ণিয়া জেলা ছিল সতীনাথের কাছে স্বপ্নের সাধের শহর। তাঁর অন্যতম ভালোলাগার শহর তিলোত্তমা কলকাতাও তাঁকে এতটা টানেনি, যতটা টেনেছে তাঁর নিজের শহর পূর্ণিয়া। তাই রেণু তাঁকে বলেছেন — "উনি কোনো ইষ্ট ছিলেন না - পূর্ণিয়া ইষ্ট ছাড়া।" [১৪]

১৯৪৪-এর ৫ই মে গান্ধীজীকে কারামুক্ত করে ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের পরিসমাপ্তি হয়। তবে কংগ্রেস তার স্বাধীন ভারতের দাবী থেকে সরে আসেনি। গান্ধীজীর নেতৃত্বে চলতে থাকে কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলন। এরই মধ্যে ১৯৪৬-এর ১৮ই ফেব্রুয়ারী নৌবিদ্রোহ শুরু হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে ২৪শে মার্চ ১৯৪৬ ভারতে ক্যাবিনেট মিশন গঠিত হল। এই বছরেরই ১৬ই আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' ঘোষিত হলে প্রথমে কোলকাতায় তারপর নোয়াখালি ও বিহারে দাঙ্গা শুরু হয়। ক্রমেই এই দাঙ্গা প্রবল আকার ধারণ করতে থাকে। এমতাবস্থায় গান্ধীজী মুসলীম লীগের পৃথক রাষ্ট্রের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হন। এরপর ১৯৪৭-এর ৩রা জুন লর্ড মাউন্টব্যাটেন

তাঁর ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন' -এর খসড়া উত্থাপন ও উপস্থাপন করেন এবং বিনা বাধায় পার্লামেন্টে তা পাশ হয়ে যায়। তারপর ১৮ই জুলাই স্বাধীনতা বিল রাজকীয় অনুমোদন পায় এবং আইনে পরিণত হয়। এই অনুসারে সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্ট 'ভারত ও পাকিস্তান' নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবে এবং দুটি রাষ্ট্রের জন্যই দু'জন গর্ভনর জেনারেল থাকবেন ও স্বতন্ত্র আইন সভা থাকবে। তবে নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত উভয় রাষ্ট্রেই ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন চালু থাকবে। প্রায় বাক্‌রুদ্ধকর পরিস্থিতিতে কংগ্রেস দেশভাগের পরিকল্পনা সহ মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাবকে গ্রহণ করে। গান্ধীজী এই প্রস্তাবকে মেনে নিতে বাধ্য হলেও তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন — "সর্দার প্যাটেল ও জওহরলাল মনে করে যে, আমার পরিস্থিতি বুঝতে ভুল হয়েছে। ..... দেশ ভাগ হলে নাকি শান্তি ফিরবে। ..... কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা ভুল পথে এগোচ্ছি।" [১৫]

১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্ট দীর্ঘদিনের লড়াই-এর পর ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। তবে পূর্ণ ভারতবর্ষ নয়, দ্বিখণ্ডিত হয়ে সৃষ্টি হয় দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র — ভারত ও পাকিস্তান। ভারতবাসী তাদের বহু প্রত্যাশিত, বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করল দ্বিখণ্ডিতের মধ্যে দিয়ে।

সতীনাথ ছিলেন সত্য দ্রষ্টা। তাই অনেক আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন কংগ্রেসি রাজনীতির নিষ্ফলতা। গান্ধীজীর আদর্শে ব্রতী হয়ে সতীনাথ যখন সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিলেন তখন তিনি রাজনীতির কাজেই গ্রামে গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে দেখেছেন কিছু নেতা ও কায়েমী স্বার্থন্বেষী মানুষের আপাত মুখোশের আড়ালে থাকা নগ্ন-হিংস্র রূপকে। সতীনাথ রাজনীতি করতে করতে আরও বেশি করে মানুষকে চিনেছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব থেকেই তিনি দেখেছিলেন এক শ্রেণীর চতুর-চটুল মানুষকে, যারা সাধারণ মানুষের sensetive imotion গুলিকে কাজে লাগিয়ে, তাদেরকে বোকা বানিয়ে কীভাবে সুযোগ বুঝে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিচ্ছে। স্বাধীনতার পর ক্ষমতালাভের আশায় মত্ত এই প্রবঞ্চক মানুষগুলির মুখোশ একে একে মনে পড়ে গেল। সকলেই নিজের নেতা মন্ত্রীত্ব লাভের ইঁদুর দৌড়ে নিজেকে সামিল করেন। সুবিধাবাদী কংগ্রেস রাজনীতির এই নগ্ন চেহারা সতীনাথকে ক্রমশ আহত করে। দেশসেবার নামে কংগ্রেস নেতারা যে ব্যবসা শুরু করেছিলেন তা বুঝতে একটুও কষ্ট হয়নি মননশীল-বিদগ্ধ দৃষ্টির সতীনাথের। তাঁর আদর্শবাদী মন এই দুর্নীতি ও ছদ্ম দেশপ্রেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাই ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি কাউকে কিছু না জানিয়েই হঠাৎ একদিন কংগ্রেস রাজনীতি থেকে পদত্যাগ করেন। বহু বিশিষ্ট নেতাদের অনেক অনুরোধ-উপরোধও সেদিন সতীনাথকে আর ফিরিয়ে আনতে পারেনি। শোনা যায় জীবনের শেষদিন পর্যন্তও তিনি আর কংগ্রেস কার্যালয়ে যান নি। একদিন যেমন সকল

পূর্ণিয়াবাসীকে অবাক করে সতীনাথ কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন, তেমনি আবার সকল পূর্ণিয়াবাসীকে বিস্মিত করেই তাঁর কংগ্রেস পার্টি থেকে বিদায় নেওয়া। কেন তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করলেন তার সঠিক কোন কারণ তিনি কাউকে বলেননি। তবে ফণিশ্বরনাথ রেণুর লেখা থেকে জানা যায় — "১৯৪৭ সালে কংগ্রেস থেকে ত্যাগপত্র দিয়ে অফিস থেকে ফিরে আসছেন। একজন পুরনো গ্রামীণ কংগ্রেস কর্মী জিগ্‌গেস করল — 'কেন ভাদুড়ী জী? কংগ্রেস কেন ছেড়ে দিচ্ছেন?' হেসে জবাব দিলেন — 'কংগ্রেসের কাজ স্বাধীনতা লাভ করা ছিল। সে কাজ তো হাসিল হয়ে গেছে। এখন 'রাজকাজ' ছাড়া কোনো কাজ নেই আর।' " [১৬]

তবে কংগ্রেস পার্টি থেকে পদত্যাগ করলেও, তখনও বোধ হয়, সতীনাথের সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি থেকে সরে আসার উপযুক্ত সময় আসেনি। তাই বেশ কয়েক মাস পর (৩-৪ মাস) সতীনাথ কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। ফণীশ্বরনাথ রেণুর লেখা 'ভাদুড়ী জী' প্রবন্ধ থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায় — "কংগ্রেস ছাড়বার পরে অনেকদিন কোনো পার্টিতে যোগদান করেন নি। আমরা সবাই চুপচাপ ছিলাম — দেখি কি করেন! ..... তিন-চার মাস পরে হঠাৎ আমাদের অফিসে এসে হাজির। বোধ হয় আমাকে কিছু বলতে এসেছেন। আমাকে দেখে বললেন — "কই, তোমাদের 'প্লেজ' দেখি।' 'প্লেজ' হাতে নিয়ে আগাগোড়া পড়ে পকেট থেকে কলম বের করে সই করে বললেন — "তুমি প্রস্তাবকের জায়গায় সাইন করবে?" [১৭]

কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে সতীনাথ কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন ঠিকই, কিন্তু সেখানেও বেশি দিন স্থায়ী হলেন না। অল্প কিছুদিন পরই এই পার্টি থেকেও তিনি বেরিয়ে এলেন। তবে এই বেরিয়ে আসাই সতীনাথের পার্টি তথা রাজনীতির জগৎ থেকে পুরোপুরি ভাবে বেরিয়ে আসা। ১৯৩৯ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত সতীনাথ ভাদুড়ীর রাজনৈতিক জীবনের অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে এবারে। সতীনাথ ভাদুড়ীর রাজনীতিতে প্রবেশ এবং রাজনীতি থেকে চির বিদায় গ্রহণ; এই দুই-এর মধ্যে দিয়ে সতীনাথকে চিনে নেওয়া যায় সহজেই। কেন তিনি রাজনীতি থেকে সরে এলেন — কি তার নিগূঢ় কারণ? এই সম্পর্কে গোপাল হালদার লিখেছেন —

"প্রথমত : যে আদর্শবাদিতার বশে সতীনাথ রাজনীতিতে এসেছিলেন ক্রমেই সে আদর্শ অবজ্ঞাত হয়। ১৯৪৭ এর পরে সেই আদর্শ সম্পূর্ণ অস্বীকৃত — Revolution রইল unfinished or betrayed, এই যথেষ্ট কারণ।

দ্বিতীয়ত : একটা জীবনে জীবন যোগ করার প্রয়োজন সতীনাথ বোধ করেছিলেন, আপনার আত্ম বিশ্বাসের তাড়নায় অনুভব করেছিলেন সেই প্রয়োজন আর ওতে সিদ্ধ হতে পারে না। বরং যে অভিজ্ঞতা অঙ্গীকৃত হয়েছে তাঁর নিজের দায়িত্ব শিল্প নিয়মে সেই অভিজ্ঞতার রূপায়ণ।

তৃতীয়ত : সেই বিশ্বাসজীর কথাও সত্য। বিশ্বাসজী তাঁর সেক্রেটারীকে রাজনীতি ত্যাগের কারণ বলেছিলেন — "যতকাল চলল চালালাম। আর চলল না। এতে প্রত্যেক মুহূর্তটা এমন কাজের ঠাস বুননি ভরা যে শেষ পর্যন্ত এ সবের মানেটা পর্যন্ত হারিয়ে যায়। একাজ থেকে পরের কাজ, তারপরের কাজ — মুহূর্তগুলো একরকম সবগুলো সমান কাজের হলে কোনটা ছোট কোনটা বড় মুহূর্ত বুঝবে কি করে? নমস্কার করছ, হেসে কথা বলছ — ভয় দেখাচ্ছ, আশ্বাস দিচ্ছ, সবগুলো একরকম। তোমার টাইপরাইটারটার এ যেমন ঠক্ ঠক্ একটা অক্ষরের পর একটা অক্ষরের ছাপ পড়ে সেই রকম। কাজের চিঠিতে যেমন অকাজের চিঠিতেও তেমন। সব সময় এক রকম। আর চলল না।"

"এর বেশি বিশ্বাসজী বলেন নি — আমাদেরও জানার দরকার নেই। .... স্থির নির্মল বুদ্ধি ও আন্তরিক সততার বলেই সতীনাথ সেই মন্থন শেষ বাসুকী বিষ থেকে আপনাকে রক্ষা করলেন; সেই জীবনের ও মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের অমৃত-আস্বাদন হৃদয়ে নিয়ে সতীনাথ আপন সাধনার দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করলে।"[১৮]

একদিন বনেদী অভিজাত পরিবারের সচ্ছল-নিশ্চিত নিরাপদ জীবনের গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে এসে টীকাপট্টি আশ্রমের বিলাসহীন সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনকে বরণ করে নিয়েছিলেন পূর্ণিয়ার ভাট্টাবাজারের ব্যবহারজীবী পিতার ষষ্ঠ সন্তান সতীনাথ। কিন্তু সেখানেও বেশিদিন স্থায়ী হতে পারলেন না। মাত্র ন' বছরের মধ্যে (১৯৩৯-৪৮) সতীনাথের রাজনীতি জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। রাজনীতির জগৎ থেকে অবসর নিয়ে সতীনাথ আবার ফিরে এলেন তাঁর সেই পূর্ণিয়ার বাড়িতে। এখানে এসে শুরু হল তাঁর জীবনের তৃতীয় অধ্যায়।

সতীনাথ চেয়েছিলেন জীবনে জীবন যোগ করতে। আর তাঁর এই চাওয়া থেকেই একদিন তিনি সতু বা সতীনাথ থেকে হয়ে উঠেছিলেন 'ভাদুড়ীজী'। তারপর আবার 'ভাদুড়ীজী' থেকে হয়ে উঠলেন সতীনাথ ভাদুড়ী। আর এই সতীনাথ ভাদুড়ী হয়ে ওঠার পেছনে রয়েছে তাঁর সাহিত্য সাধনা ও সাহিত্য সৃষ্টি। ১৯৪৮ সালে পূর্ণিয়ায় নিজের বাড়িতে ফিরে এসে সতীনাথ শুরু করলেন তাঁর সাহিত্যিক জীবনের নতুন অধ্যায়। ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলে বসে একদিন যে সাহিত্য রচনার সূচনা করেছিলেন এবারে সেই স্রোত ক্রমশ ফল্গু ধারার মতো এগিয়ে চলল। ১৯৪৫-এর ৪ঠা অক্টোবর প্রকাশিত হয়েছিল সতীনাথের প্রথম উপন্যাস 'জাগরী'। 'জাগরী' সতীনাথের কারাজীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিণামী ফসল। আপাতভাবে মাত্র একটি রাতের কাহিনী 'জাগরী' লিখতে সতীনাথের সময় লেগেছিল চারমাসেরও বেশী। আসলে সতীনাথ এই উপন্যাসের কাহিনীটিকে শুধু অভিজ্ঞতার তথ্য বিবরণী করে তুলতে চান নি। এটি ছিল তাঁর কাছে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার 'ভাষ্যদীপিত' ফসল। তাই এই বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গোটা কলকাতা শহর জুড়ে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বহু বিদগ্ধজন এই বইটির লেখককে চিনে নিতে চাইছিলেন। এই নতুন লেখকের লেখা বইটি পড়ে প্রখ্যাত সাহিত্যরসিক অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছিলেন — "লেখকের আর কোনো লেখা

পড়িনি। তাঁর নামও শুনিনি। কিন্তু এ বই একেবারে ওস্তাদ লিখিয়ের লেখা। প্রথম চেষ্টার জড়তার চিহ্ন কোথাও নেই। শক্তির ছাপ সর্বত্র। নবীনত্বে ঝলমল করছে।"[১৯] ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত 'জাগরী' ১৯৫০ সালে প্রথম রবীন্দ্র পুরস্কারেও পুরস্কৃত হয়েছিল।

সতীনাথ ছিলেন খুব পরিমিত লেখক। তাঁর লেখনী কখনোই অজস্রবর্ষী হয় নি। তাই সমস্ত সাহিত্য জীবনের পরিসরে (১৯৪৫-১৯৬৫) সতীনাথ রচনা করেছিলেন মোট ছ'টি উপন্যাস ও ৬২টি ছোট গল্প। এছাড়া 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' নামে একটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত, কয়েকটি প্রবন্ধ এবং বেশ কিছু কবিতা।

'জাগরী'র মত যুগান্তকারী উপন্যাসের পর সতীনাথ রচনা করেন 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' নামে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস। ১৯৪৮-এ এটি রচিত হয়। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের মাঘ থেকে ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত 'বসুমতী' পত্রিকায় উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর ১৩৫৬ (১৯৪৯ খ্রীঃ) বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সতীনাথ তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাসকে বৈচিত্র্যে ভরিয়ে তুলেছেন। এই উপন্যাসটিতেও তাঁর ব্যতিক্রম হয়নি। তবে উপন্যাসের পটভূমি বিহারের পূর্ণিয়া জেলার বলীরামপুর ও শিরানিয়া গ্রাম। ১৯৪৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পরের দিন থেকে শুরু করে প্রায় ১৫ দিন ধরে চলে উপন্যাসের ঘটনার কাল পরিধি। উপন্যাসের নায়ক অভিমন্যুর চিতা-দৃশ্য দিয়ে ঘটনার সূত্রপাত করিয়ে তারপর ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে অতীতে ফিরে গিয়ে মূল ঘটনার বিস্তার। আর উপন্যাসের শেষ হয় আরেকটি মৃত্যু দৃশ্যের মধ্য দিয়ে নায়িকা শিউকুমারীর আত্মহত্যার ঘটনায়। এই দু'টি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বলীরামপুরের জুটমিলের শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের নানা চিত্রকে তুলে ধরে উপন্যাসের কাহিনীটিকে দাঁড় করিয়েছেন সতীনাথ।

সতীনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি তাঁর রচিত তৃতীয় উপন্যাস 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'। এই উপন্যাসটির প্রথম চরণ রচিত হয় ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। তবে দ্বিতীয় চরণ রচনা করতে করতে ১৯৪৯-এর সেপ্টেম্বরে তিনি বিদেশে চলে যান। প্রায় দু' সপ্তাহ লণ্ডনে কাটিয়ে ২৭শে সেপ্টেম্বর তিনি প্যারিসে চলে যান; সেখানে তিনি প্রায় ৭ মাস কাটানোর পরে ১৯৫০-এর ১৫ই এপ্রিল তিনি জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে প্রায় দুই মাস থেকে ১৯৫০-এর ২রা জুন সতীনাথ দেশে ফেরার জন্য যাত্রা করেন। প্রায় ১০ মাসের এই বিদেশ ভ্রমণে সতীনাথ অনেক বিদেশী ভাষা চর্চা করেছিলেন। ১৯৫০ সালে দেশে ফিরে সতীনাথ পুনরায় লিখতে শুরু করেন 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর দ্বিতীয় চরণ। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' সতীনাথের জীবনের অভিজ্ঞতা ও কল্পনালব্ধ উপন্যাস। রাজনীতি করা কালীন পূর্ণিয়ার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানোর সময়ই সতীনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন ঢোঁড়াই-এর মত বহু যুবককে। বাস্তবে ঢোঁড়াই ছিল একজন অতি সাধারণ

দেহাতি যুবক, কিন্তু সতীনাথের চিন্তায় সে হয়ে উঠল একেবারে একজন আদর্শ মানুষ। তবে ঢোঁড়াই চরিত্রকে গড়ে তোলার পেছনে ছিল বাস্তবে দেখা একটি মানুষের চরিত্রের আদল। এ সম্পর্কে সতীনাথ তাঁর স্মৃতি কথায় লেখেন — "তাতমাটুলিতে ঢোঁড়াই নামে একজন লোক সত্যিই ছিল। সে এক বছর আগে স্বর্গে গিয়েছে।"[২০] জিরানিয়ার তাতমাটুলি, ধাঙড়টুলি, বিসকান্ধা প্রভৃতি গ্রামের নাম, তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের অনেক খুঁটিনাটি বিবরণ থাকলেও সতীনাথ উপন্যাসটিকে গড়ে তুলেছেন তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস'-এর ছাঁচে ফেলে।

'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর পর কাহিনী ও ঘটনার ভিন্নতা নিয়ে প্রকাশিত হল সতীনাথের চতুর্থ উপন্যাস 'অচিনরাগিণী' (১৯৫৪)। সতীনাথের চিন্তার জগৎ, কল্পনার জগৎ এত প্রসারিত ছিল, তাঁর অভিজ্ঞতা এত সুদূরপ্রসারী ছিল যে তাঁর কোন লেখাই একই বিষয় নিয়ে রচিত হয়নি। বিশেষ করে তাঁর ছটি উপন্যাসের একটির থেকে আরেকটি বিষয়, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সবদিক থেকেই ভীষণ ভাবে আলাদা। 'জাগরী', 'চিত্রগুপ্তের ফাইল', 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' এই উপন্যাসগুলিতে ঘটনাকে প্রাধান্য দিলেও 'অচিনরাগিণী'-তে এসে সতীনাথ সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে হাঁটেন — চিরাচরিত ঘটনার বাহুল্যকে উপেক্ষা করে তিনি তাঁর উপন্যাসকে সাজিয়ে তোলেন চিন্তার স্রোতধারায়। আপাত দৃষ্টিতে এই উপন্যাসের গঠন কৌশলকে খানিকটা 'জাগরী'র মতো মনে হলেও 'জাগরী'র পদ্ধতি এখানে পুরোপুরি অনুসৃত হয়নি। পিলে, তুলসী, নতুন দিদিমা — অসমবয়সী তিনটি চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের দলিল সতীনাথের 'অচিনরাগিণী' উপন্যাস।

১৯৫৭ সালে বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয় সতীনাথের পঞ্চম উপন্যাস 'সংকট'। সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ও আঙ্গিকে রচিত এই উপন্যাসে সতীনাথের অনুসন্ধানের একটা প্রতিমূর্তি উঠে আসে। রাজনীতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছনোর প্রাক্ মুহূর্তে বিশ্বাসজী রাজনীতির মহল থেকে হঠাৎ চিরবিদায় নিয়ে বাড়িতে এসে বসেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছেন জনসেবা আর রাজনীতি করার মধ্যে উত্তেজনা, রোমাঞ্চ, সাফল্য, গর্ব এবং আরো অনেক কিছুই আছে — কেবল নেই আত্ম অনুসন্ধান। এই উপলব্ধিতেই বিশ্বাসজী বাইরের কাজের জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন এবং তারপর জীবন জিজ্ঞাসার সম্মুখে উঠে এসেছে অতীতের কথা, কত ঘটনা, কত স্মৃতি। সতীনাথের সমস্ত সাহিত্য কর্মই প্রায় বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। তবে নিজের জীবনের আত্মোপলব্ধিতে ভাস্বর হয়ে আছে তাঁর এই উপন্যাসটি।

সতীনাথের ষষ্ঠ ও শেষ উপন্যাস 'দিগভ্রান্ত' (১৯৬৬)। তবে সতীনাথ জীবিতকালে এই উপন্যাসটির প্রকাশ দেখে যেতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'দিগভ্রান্ত' উপন্যাসটির মূল সমস্যা দাম্পত্য সম্পর্কের দিগভ্রান্তি। স্বামীর ব্যক্তিত্বের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে অতসীবালা অবলম্বন করেছিলেন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে, আর তারই ফলশ্রুতিতে ভেঙ্গে

গিয়েছিলো তাদের দাম্পত্য জীবন। এখানে একটি কথা বলা অবশ্যই প্রয়োজন যে দিগভ্রান্ত রচনার পূর্বে সতীনাথ কিছুদিন বৃন্দাবন গিয়ে এক বৈষ্ণব আশ্রমে কিছুকাল বাস করেছিলেন। দিগভ্রান্তের উপকরণ, উপাদান, বিষয়বস্তু সেখান থেকেই সংগৃহিত হয়েছিল।

'জাগরী' উপন্যাসটি রচনা করবার পর রাজনৈতিক জীবনে থাকাকালীনই সতীনাথ রচনা করেছিলেন বেশ কয়েকটি ছোটগল্প। তারপর রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে সতীনাথ যখন সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হয়ে রচনা করে চলেছেন উপন্যাস তখন এই উপন্যাস রচনার ফাঁকে ফাঁকেই তিনি লিখেছেন বেশ কিছু ছোটগল্প। ব্যক্তিগত জীবনে শান্ত-স্বভাব এই মানুষটি আসলে ছিলেন জীবন রসিক। আর এই জীবন রস পিপাসা তাঁকে মানব জীবনের বিচিত্ররূপকে জানতে অভিলাষী করে তোলে। তাঁর এই জীবন রস পিপাসা তথা মানব জীবনকে জানার অধীর আগ্রহ থেকেই তিনি লেখনী ধরেছিলেন। সতীনাথ জীবনকে দেখেছিলেন খুব কাছ থেকে। জীবনের প্রত্যেকটা অন্ধকার গলি-ঘুঁজির মধ্যেও তিনি প্রবেশ করেছিলেন অধীর আগ্রহে। জীবনটাকে কখনো রঙিন চশমার মধ্য দিয়ে দেখতে চেষ্টা করেন নি। তাই মোহহীন কল্পলোকের স্বপ্নহীন অতিবাস্তব সমস্যা জর্জরিত মানুষ ও সমাজকেই তিনি দেখেছিলেন, জেনেছিলেন, চিনেছিলেন। সতীনাথরা ছিলেন প্রবাসী বাঙালী। কিন্তু প্রবাস তাঁর কাছে কখনো প্রবাস হয়ে থাকেনি। হয়ে উঠেছিল তাঁর একান্ত আপন জন্মভূমি। প্রান্ত বিহারের একটি ছোট্ট জেলা শহরে বসবাস করে তিনি বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রাকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আর তাঁর সেই বাস্তব অভিজ্ঞতাই বাঁধা পড়েছে তাঁর গল্প দেহে। সতীনাথের রচিত প্রায় সব গল্পই তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত। তাই তাঁর প্রত্যেকটি গল্প হয়ে উঠেছে বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের বিহারের জেলা শহর ও গ্রামের জীবন্ত দলিল। নিজের বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করেই সতীনাথ রচনা করেন তাঁর ছোটগল্পগুলি। রচনা রীতিতে, ভাষার প্রাঞ্জলতায়, রূপাঙ্গিকের অভিনবত্বে সতীনাথের ছোটগল্পগুলি হয়ে উঠেছে অনন্য। তাঁর রচিত মোট ৬২টি ছোট গল্প স্থান পেয়েছে যে গল্পগ্রন্থগুলোতে সেগুলি হল — 'গণনায়ক' (১৯৪৮), 'অপরিচিতা' (১৯৫১), 'চকাচকী' (১৯৫৬), 'পত্রলেখার বাবা' (১৯৫৯), 'জলভ্রমি' (১৯৬২), 'অলোকদৃষ্টি' (১৯৬৪) এবং 'সতীনাথ বিচিত্রা' (১৯৬৫)। তবে 'সতীনাথ বিচিত্রা' গল্পগ্রন্থ নয়, এটি সতীনাথের বিভিন্ন রচনার সংকলন। এই ছ'টি গল্প গ্রন্থের প্রতিটি গ্রন্থে যে গল্পগুলি সন্নিবিষ্ট রয়েছে তা দেখে নেওয়া যাক। সতীনাথের প্রথম প্রকাশিত গল্প গ্রন্থটি হল 'গণনায়ক' (১৯৪৮)। এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে পাঁচটি গল্প — (১) গণনায়ক (২) বন্যা (৩) আন্টাবাংলা (৪) পঙ্কতিলক (৫) ভূত। 'গণনায়ক'-এর পর ১৯৫১ তে প্রকাশিত হয় সতীনাথের দ্বিতীয় গল্প গ্রন্থ 'অপরিচিতা'। এই গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে সাতটি গল্প — (১) অপরিচিতা (২) পরিচিতা (৩) ফেরবার পথ (৪) রথের তলে (৫) ষড়যন্ত্র মামলার রায় (৬) অনাবশ্যক (৭) ঈর্ষা।

'চকাচকী' সতীনাথের তৃতীয় গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে স্থান পেয়েছে মোট আটটি গল্প — (১) চকাচকী (২) বৈয়াকরণ (৩) ডাকাতের মা (৪) বিবেকের গণ্ডী (৫) মুষ্টিযোগ (৬) রাজকবি (৭) মুনাফাঠাকুরণ (৮) তবে কি? এরপর সতীনাথের ৪র্থ গল্প গ্রন্থ 'পত্রলেখার বাবা' — প্রকাশিত হয় ১৯৫৯তে। এখানে প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা ন'টি — (১) পত্রলেখার বাবা (২) কম্যাণ্ডার ইন চীফ (৩) বাহাত্তুরে (৪) কণ্ঠকুণ্ডতি (৫) সাঁঝের শীতল (৬) একটা কিংবদন্তীর জন্ম (৭) পূতিগন্ধ (৮) অভিজ্ঞতা (৯) ধস। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় সতীনাথের পঞ্চম গল্পগ্রন্থ 'জলভ্রমি' — সেখানে স্থান পেয়েছে মোট নয়টি গল্প। সেগুলি হল — (১) মহিলা-ইন-চার্জ (২) কৃষ্ণকলি (৩) জলভ্রমি (৪) স্বর্গের স্বাদ (৫) চরণদাস এম-এল-এ (৬) দাম্পত্য সীমান্তে (৭) দুই অপরাধী (৮) পদাঙ্ক (৯) হিসাব নিকাশ। ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয় সতীনাথের শেষ তথা ষষ্ঠ গল্পগ্রন্থ 'অলোক দৃষ্টি'। এখানে যে দশটি গল্প স্থান পেয়েছে সেগুলি হল — (১) অলোক দৃষ্টি (২) জাদুগণ্ডী (৩) ব্যর্থ তপস্যা (৪) পরকীয় সন-ইন-ল (৫) তিলোত্তমা সংস্কৃতি সংঘ (৬) জোড়কলম (৭) বয়োকমি (৮) শেষ সংখ্যান (৯) গোঁজ (১০) সরমা।

সতীনাথের এই ছয়খানি গল্প গ্রন্থ ছাড়াও সতীনাথ বিচিত্রা (১৯৬৫) নামক রচনা সংকলনে প্রকাশিত হয় মোট ১৪টি গল্প। সেগুলি হল — (১) দিগ্‌ভ্রান্ত (২) মা আম্রফলেষু (৩) বমি কপালিয়া (৪) তলানির স্বাদ (৫) আজাগড় (৬) রোগী (৭) ব্লাডপ্রেসার (৮) এক চক্ষু (৯) এক ঘন্টার রাজা (১০) করদাতা সংঘ জিন্দাবাদ (১১) রহস্য (১২) জামাইবাবু (১৩) ওয়ার কোয়ালিটি (১৪) আন্তর্জাতিক। সতীনাথ শুধু উপন্যাস-ছোটগল্পই রচনা করেন নি, তাঁর একটি অনবদ্য গ্রন্থ 'সত্যিভ্রমণ কাহিনী' — নিজের বিদেশ ভ্রমণের কাহনী ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই বইটি লিখিত হয় ডায়ারি ও উপন্যাসের ভঙ্গিতে ১৯৫১ সালে। সতীনাথের প্রবন্ধ ও রম্যরচনার সংখ্যা দশ, কবিতার সংখ্যা চার এবং নাটকের সংখ্যা একটি।

প্রবন্ধ ও রম্য রচনা — 'ঢোঁড়াই', 'দুইটি খেলা', 'সসংকোচ', 'আমি ও কালিদাস', 'অনুসন্ধানী', 'প্যারিস ও লণ্ডন', 'ম্যাকারোনির স্মৃতি', 'পড়ুয়ার নোট থেকে', 'মধুসূদন ও লাফঁতেন', 'ইংল্যাণ্ডে গান্ধীজী', প্রভৃতি।

কবিতা — 'গোলাপ জাগো জাগো', 'দিনপঞ্জী', 'মোচের লড়াই', 'মোহন পুরের ছবি'।

নাটক — 'পারবে না এদের সঙ্গে'।

এগুলি ছাড়াও 'জাগরী' উপন্যাসটির ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন 'Vigil' (১৩৫৮ বঙ্গাব্দের 'পরিচয়' পত্রিকার অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যায় ১৯৬৫ তে প্রকাশিত হয় দল) নামে। সতীনাথ সাহিত্য মহলে মূলত ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার হিসেবেই সমাদৃত হয়েছেন; কিন্তু তবুও তাঁর প্রবন্ধ, রম্য রচনাগুলি বিদগ্ধ জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সতীনাথ যখন রাজনীতির জগৎ থেকে চির বিদায় নিয়ে পূর্ণিয়ায় নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন, তখন সাহিত্য চর্চা ছাড়াও তাঁর আরেকটি বড় শখ ছিল বাগান করা। সতীনাথ ছিলেন ভীষণ ভাবে প্রকৃতি প্রেমিক। তাঁদের বাড়িতে আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল গাছের বিশাল বাগান। সতীনাথ গোলাপ ফুল খুবই পছন্দ করতেন। নির্জন বাড়িতে একজন মালি ও একটা কুকুর সবসময়ের সঙ্গী ছিল অকৃতদার মানুষটির। আর তার সঙ্গে ফুলগাছ নিয়ে নানা রকম চর্চা। ফুল ও ফল গাছের বিষয়ে শুধু আগ্রহই নয়, এ বিষয়ে বিস্তর পড়াশোনাও করেছেন সতীনাথ। একটি গাছের বেড়ে ওঠাকে তিনি গভীর ভাবে প্রত্যক্ষ করতেন। একজন মা যেমন তার সদ্যজাত শিশু সন্তানকে যত্ন করে তাকে একটু একটু করে বড় করে তোলেন, সতীনাথ তেমনি একটি চারাগাছকে নিজের সেবা-যত্ন দিয়ে বড় করে তোলেন। এই সম্পর্কে গোপাল হালদার বলেছেন —

" ..... রাত্রিতে আমরা গল্প করছি — একবার টর্চ নিয়ে সতীনাথ নীরবে বেরুলেন। একটু পরে ফিরে এলে জানলাম একটি ফুল ফুটতে আরম্ভ করেছিল, কতটা ফুটছে তা দেখে এলেন। ..... ফুলের একটু একটু করে ফোটা এমনি তাঁর কাছে কৌতূহলোদ্দীপক।" [২১]

বনফুল সতীনাথের এই প্রকৃতি প্রীতি সম্পর্কে লিখেছেন — "আমার সঙ্গে যখনই আলাপ হয়েছে তখন তা সাহিত্য বিষয়ে হয়নি, গোলাপ নিয়ে হয়েছে। আমার সঙ্গে যখন সে দেখা করতে এসেছিল, আমার জন্য বই আনেনি, এনেছিল একটা অর্কিড।" [২২]

গাছপালার সঙ্গে সঙ্গে সতীনাথ ভীষণ রকম ভালোবাসতেন বিভিন্ন পাখিদের। তাঁর বাগানের বিভিন্ন গাছের ডালে যে সকল পাখিরা এসে বাসা বাঁধে তাদেরকে সতীনাথ খুব নিখুঁত ভাবে লক্ষ করতেন। লক্ষ করতেন গ্রীষ্মকালে গাছে জল দেবার সময় পাখিরা স্নান করতে আসে নিজেদের মধ্যে কীরকম ঠেলাঠেলি করে। সাহিত্যিক শ্রী গোপাল হালদারের ভাষ্যে উঠে আসে সতীনাথের পক্ষীপ্রেমের কথা —

" ..... পরদিন সকালবেলা ৮টা ৯টা হবে। চা খাওয়ার পর বারান্দায় বসে আমরা গল্প করছি, হঠাৎ সতীনাথবাবু একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি কান খাড়া করে বললেন, 'শুনছেন?' বাড়ির সীমান্তের বড় বড় গাছগুলির মধ্যে একটি পাখির ডাক। ঋতু পরিবর্তনের আগন্তুক পাখি। সতীনাথ বাবু উজ্জ্বল স্নিগ্ধ চোখে বললেন — 'এবার নয়দিন আগে এল, গত বৎসর এসেছিল।' — তারিখ বললেন — 'গত বৎসর একটু দেরী হয়েছিল। এবার বেশ আগে এল। সাধারণত আরো দিন চার পরে আসে।' তিনি সহজভাবে পূর্বেকার দু-চার বছরের তারিখ বললেন — যেন বাড়ীর ছেলে মেয়ের জন্মের তারিখ — মনে গাঁথা।" [২৩]

সতীনাথের আরেকটি শখের বিষয় ছিল রান্না করা। যদিও ভাত, আলুসেদ্ধ, কলাসেদ্ধ, দু'চামচ মাখন ও একটু দই এই ছিল তাঁর দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা। কিন্তু মাঝে মাঝেই তিনি বেশ ভালো-মন্দ রান্না করে বন্ধুবান্ধব ও অতিথিদের খাওয়াতেন। ডাঃ বীরেন ভট্টাচার্য সতীনাথের রান্নার

শখের কথা লিখেছেন —

"রান্না করা ও মিষ্টি তৈরী করাতে সতুদার শখ ছিল প্রচুর। নারকেল নাড়ু, নারকেল চিংড়ী, গোকুল পিঠে, দইবড়া নিজে হাতে বানিয়ে আমাদের খাইয়েছেন অনেকবার। যখন বলি সুন্দর হয়েছে, তখন হেসে বলতেন — তোর মার চেয়ে ভাল অবশ্য নয়, তবে এসব যে মেয়েদের একচেটিয়া ব্যাপার নয়, তা প্রমাণ করেছি তো।" [২৪]

ফণীশ্বর নাথ রেণুও তাঁর 'ভাদুড়ী জী' প্রবন্ধে সতীনাথের রান্নার শখের কথা উল্লেখ করেছেন —

"আলু আর কলাসেদ্ধ করতে 'পাক-বিজ্ঞান বা কলা'-র জ্ঞান আবশ্যক নয়। কিন্তু পাউরুটির স্লাইস 'টোস্ট' করা নিশ্চয় একটা আর্ট। ওরকম নিখুঁত, মচমচে আর আগাগোড়া একই রকম 'সেঁক' দেওয়া ইলেকট্রিক টোস্টোরেই সম্ভব। ডিমের পুডিংও ভালো করতেন। .... ভাদুড়ী জী একদিন 'মোতঞ্জন' (একরকমের পোলাও) রান্না করে যমুনা বাবুকে অবাক করে দিয়েছিলেন। .... উনি ভাদুড়ীজীর তৈরী মোতঞ্জনের রঙ দেখে এবং 'খুশবু'তেই বুঝেছিলেন — ওস্তাদ হাতের রান্না! বললেন — "হম তো সমঝতে থে কি আপ আলু কেলা সিদ্ধ করনা ছোড়কর আউর কুছ ভী নহীঁ জানতে হ্যাঁয়। লেকিন আপ তো সিদ্ধহস্ত পাকশাস্ত্রী নিকলে .....।" [২৫]

এ ভাবেই একদিকে শিল্পীর নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্য চর্চা-সাহিত্য সৃষ্টি, গাছপালা-পশুপাখির প্রতি উদার ভালোবাসা — এসব নিয়েই অকৃতদার, আত্মীয়-পরিজন বিহীন সতীনাথের জীবন ছিল পরিপূর্ণ। কিন্তু এরই মাঝে ১৯৫৫ তে সতীনাথের পালমোনারি ধমনিতে মিডিয়াস্টাই নামে ম্যালিগনেন্ট টিউমার ধরা পড়ে। কিন্তু অদম্য সতীনাথ এতে এতটুকুও ঘাবড়ে যাননি। রোগ তাকে বশ করতে পারেনি। তিনি এই কঠিন রোগের কঠোর ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করেই চলতে থাকেন। নিজের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম থেকে শুরু করে সাহিত্য চর্চা সবই প্রায় সমান ভাবেই চলতে থাকে। শুধু মাঝে মাঝে একটু বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে ক'দিন বিশ্রাম নিতেন। তার পরেই আবার পুরোনো রুটিনে ফিরে যেতেন। সতীনাথ সেভাবে কোনদিন এই ক্ষয় রোগের চিকিৎসা করেন নি। এদেশে এর চিকিৎসা ছিল না বলে তিনি কখনো বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করানোর কথা ভাবেন নি। 'অচিনরাগিণী' (১৯৫৪) উপন্যাসটি রচনার পর বেশ কয়েক বছর সতীনাথ কিছু লেখেন নি, এই সময়ই ১৯৬১ তে 'দেশ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রী সাগরময় ঘোষ তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করেন — কেন তিনি কোন নতুন লেখা দিচ্ছেন না, তখন তার উত্তরে সতীনাথ জানিয়েছিলেন — "দু-তিন বছর কিছুই লেখা হয়ে ওঠেনি। শারীরিক অসুস্থতার জন্য দায়ী।"[২৬] তারপর একটু সেরে উঠে আবার লেখা শুরু করেন। শারীরিক অসুস্থতার ফাঁকে ফাঁকেই তিনি রচনা করতে শুরু করেন 'দিগভ্রান্ত' উপন্যাসটি। উপন্যাস লেখা বেশ খানিকটা এগোলে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে 'দেশ' পত্রিকায় চিঠি পাঠান — 'উপন্যাস প্রায় শেষ।' তারপর উপন্যাসটি শেষ

করে ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সম্পাদককে আবার লিখলেন যে, নতুন উপন্যাসটি কপি করছেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য কাজটা দ্রুত এগোচ্ছে না। কিন্তু তারপর আর কপি করা শেষ করে সতীনাথ উপন্যাসটি প্রকাশকের হাতে তুলে দিতে পারেন নি।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ শে মার্চ সকালবেলা সতীনাথ কলকাতা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। গত কয়েকদিন থেকেই শরীরটা বেশ খারাপ চলছিল। কিন্তু তিনি তো কাজের মানুষ। তাই শরীরের জন্য থেমে থাকলে চলবে না। এই কারণে সেই দিনও সকালবেলা তৈরী হয়েছিলেন। প্রাতঃরাশের সামান্য খাবার মুখে দিতেই হঠাৎ প্রচণ্ড কাশি উঠে আসে। প্রথমে তিনি মনে করেছিলেন বুঝি বিষম লেগেছে, বমি করার জন্য কল পাড়ে উঠে গেলেন। শুরু হল মুখ দিয়ে অনর্গল রক্তপাত। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশাল দেহটা লুটিয়ে পড়ল কলতলায়। বুকের সেই ম্যালিগনেন্ট টিউমারটা ফেটে গেছে। সব কিছুকে ফেলে রেখে নীরবেই চলে গেলেন সতীনাথ ভাদুড়ী। বিশাল মহীরুহ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও ১৯৬৫ সালের ৩০শে মার্চ মাত্র ৫৯ বছর বয়সে নিভে যায় এই বিরল প্রতিভার কথাশিল্পীর জীবন প্রদীপ। তারপরেই সমস্ত পূর্ণিয়া জুড়ে নেমে আসে শোকের কালো ছায়া। পূর্ণিয়াবাসী যেন অভিভাবক হীন হয়ে পড়েন এই মহান শিল্পীর মৃত্যুতে। সকল পূর্ণিয়াবাসী সেদিন সামিল হয়েছিল এই স্বল্পভাষী-অন্তর্মুখী মানুষটির অন্তিমযাত্রায়। ১৯৪৮ সালে যে কংগ্রেস অফিস ছেড়ে এসেছিলেন জীবিত অবস্থায় আর কোনদিন সে পথে পা বাড়ান নি। কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহকে নিয়ে যাওয়া হয় কংগ্রেসের অফিস ভবনে। তারপর সারা পূর্ণিয়া ঘুরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁরই পূর্ব ইচ্ছা অনুসারে পূর্ণিয়ার কোশী নদীর শ্মশান ঘাটে এবং সেখানেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর ৫৯ বছর জীবৎকালের মধ্যে সাহিত্য-চর্চা করেছিলেন মাত্র ১৮ থেকে ২০ বছর। তবুও স্বল্প সময় ও সীমিত সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়েই সতীনাথ ভাদুড়ী কথা সাহিত্যের জগৎকে নতুন আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন।

তথ্যসূত্র :

১। 'সতীনাথ স্মরণে', সম্পাদক সুবল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবন্ধ-'ইতিকথা', সুবল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ২-৩।

২। 'সতীনাথ স্মরণে', সম্পাদক সুবল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবন্ধ-'ভাদুড়ীজী', ফনিশ্বরনাথ রেণু, পৃ. ৮।

৩। 'সতীনাথ জীবন ও সাহিত্য', সন্তোষ কুমার মজুমদার, পৃ. ৩২।

৪। 'সতীনাথ স্মরণে', সম্পাদক সুবল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবন্ধ-'ইতিকথা', সুবল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ৮।

৫। তদেব, পৃ. ৮।

৬। 'ভারতের ইতিবৃত্ত', গোপালকৃষ্ণ পাহাড়ী, পৃ. ৩৬৭।

৭। তদেব, পৃ. ৩৭৪।

৮। তদেব, পৃ. ৩৭৪।

৯। তদেব, পৃ. ৩৭৪।

১০। 'সতীনাথ স্মরণে', সম্পাদক সুবল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবন্ধ-'ভাদুড়ীজী', ফনিশ্বরনাথ রেণু, পৃ. ৩৩।

১১। তদেব, পৃ. ৩০।

১২। তদেব, পৃ. ৩১।

১৩। তদেব, পৃ. ৩৬।

১৪। তদেব, পৃ. ৩২।

১৫। 'ভারতের ইতিবৃত্ত', গোপালকৃষ্ণ পাহাড়ী, পৃ. ৪২০।

১৬। 'সতীনাথ স্মরণে', সম্পাদক সুবল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবন্ধ-'ভাদুড়ীজী', ফনিশ্বরনাথ রেণু, পৃ. ৩৬।

১৭। তদেব, পৃ. ৩৭।

১৮। 'সতীনাথ ভাদুড়ী সাহিত্য ও সাধনা', গোপাল হালদার, পৃ. ২৪।

১৯। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-১, শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত, 'সতীনাথ ভাদুড়ী : প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা', পৃ. ঘ।

২০। সতীনাথ গ্রন্থাবলী-২, শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত, পৃ. ৫৩২।

২১। 'সতীনাথ ভাদুড়ী সাহিত্য ও সাধনা', গোপাল হালদার, পৃ. ৩২।

২২। 'সতীনাথ স্মরণে', সম্পাদক সুবল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবন্ধ- 'শ্রদ্ধাস্পদ সতীনাথ ভাদুড়ী', বনফুল, পৃ. ১৯।

২৩। 'সতীনাথ ভাদুড়ী সাহিত্য ও সাধনা', গোপাল হালদার, পৃ. ৩২-৩৩।

২৪। 'সতীনাথ স্মরণে', সম্পাদক সুবল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবন্ধ- 'সকল কাজের সেরা', ড. বীরেন ভট্টাচার্য, পৃ. ৬৩।

২৫। 'সতীনাথ স্মরণে', সম্পাদক সুবল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবন্ধ-'ভাদুড়ীজী', ফনিশ্বরনাথ রেণু, পৃ. ২৭-২৮।

২৬। 'সতীনাথ জীবন ও সাহিত্য', সন্তোষ কুমার মজুমদার, পৃ. ৩২।

——oo——